নিজেকে প্রমাণিত করা

মৈত্রীশ ঘটক

এক

নিজেকে বারবার প্রমাণ করা বেশ কঠিন ব্যাপার। না, আমি কোনো কর্ম বা কীর্তির কথা বলছি না, প্রতি পদে আধার-প্যান-পাসপোর্ট-ভিসা এসবের চক্করের কথা বলছি। আর প্রবাসী বলে বিদেশের ঠিকানা বা সেখানে কর্মরত কিনা সেসব প্রমাণ করারও যখন তখন দরকার হয়। দেশে যখন থাকি সবসময়ই এগুলো হাতের কাছে রাখি কারণ কখন কোথায় কীসে এগুলো লাগবে তার ঠিক নেই। আর তারপর কখন "একটা পাসপোর্ট সাইজ ফোটোও লাগবে, তার ওপর দিয়ে একটা সই করে দেবেন" এরকম অনুরোধ আসবে, তাই সেটাও তৈরি রাখি। কেওয়াইসি (KYC বা Know Your Customer) বলে একটা ব্যাপার হয়েছে যাতে ব্যাংকের কাছে এইসব নথিপত্র এবং ঠিকানার প্রমাণ দিতে হয়। ব্যাংকের অফিসার আর গ্রাহক দুজনে "আমি চিনি গো চিনি তোমারে" গেয়ে মিটিয়ে নিলে পারতো, তবু সে না হয় ঠিক আছে। কিন্তু এখন রি-কেওয়াইসি (re-KYC বা re-Know Your Customer) বলে যে একটা জিনিস হয়েছে সেটা আরো গোলমেলে—খানিকটা "তোমায় নতুন করে পাবো বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণে" গোছের ব্যাপার—পুরো প্রক্রিয়াটা কিছুদিন অন্তর অন্তর করতে হয়। কাগজেকলমে গোটা ব্যাপারটা খুব সোজা এবং অনলাইন করা যায় বলে দাবি করা হয় বটে, তবে নানা ফর্ম এবং নথিপত্র পাঠানোর কিছুদিন পরে আবার ইমেইল আসে—অমুক তথ্য বা তমুক কাগজপত্র, বা অনেকসময় ঠিক যা যা আগে পাঠিয়েছি সেই একই জিনিস পাঠানো দরকার। অর্থাৎ, আগের ধাপে করা পুরো পরিশ্রমটা জলে গেলো, আর পুরো ব্যাপারটা আবার নতুন করে করলে যে কাজে হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

তাই এই সমস্যা এড়াতে আজকাল যখন দরকার হয় কলকাতায় গিয়ে ব্যাংকের ব্রাঞ্চে সব নথি নিয়ে সশরীরে হাজির হই, তাতে কাজ হয়। নাম এক আছে, জন্মসাল এক আছে, মা-বাবার নাম এক আছে, ঠিকানা এক আছে, চাকরি, অভিবাসনের খুঁটিনাটি সব এক আছে, শুধু চুল পেকেছে হয়তো কিছু, কিন্তু যান্ত্রিকভাবে এই কাজ করে যেতে হয়। সময় নষ্টের দিকটা যদি বাদও দিই, আমরা যারা আইনমান্যকারী নাগরিক বা অভিবাসী, তাদের কাছে গোটা প্রক্রিয়াটার মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা যে সন্দেহের বাতাবরণ আছে, তা অবাক করে। যেন, প্রমাণ করতে হবে আমি প্রতারক নই, নইলে তাই ধরে নেওয়া হবে। আর ব্যাংক, সঞ্চয়, বা কর দেওয়া এসব ব্যাপারের বাইরে যাদের নিয়মিত দেশে বিদেশে যাতায়াত করতে হয়, তাদের তো প্রতি পদে নথিপত্র দেখানো ছাড়াও আঙুলের ছাপ নেওয়া হয় আর ছবি তোলা হয়, ঠিক যেমন পুলিশ থানায় সম্ভাব্য অপরাধীদের করা হয়। ভাবতে গেলে শঙ্খ ঘোষের কবিতার সেই বিখ্যাত লাইন মনে পড়ে যায়: নথি না থাকলে "আমি কি নিত্য আমারও সমান/সদরে, বাজারে, আড়ালে?"

উপরোক্ত সমস্যার কথা থাক—সময়ের অপচয় ও ধৈর্যের পরীক্ষা, তবে তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু এই বছর পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা থেকে নব্বই লক্ষেরও বেশি নাম মুছে ফেলা হয়েছিল; পরে অনেকের নাম পুনর্বহাল করা হয়, কিন্তু তার আগেই এই প্রক্রিয়ায় সুপ্রিম কোর্টের বারবার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া যাতে ভোটারদের নথি যাচাই ও শুনানি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তার চাপে একাধিক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। তালিকা থেকে বাদ পড়া বা নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কে কেউ কেউ আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন, সংশোধনের দায়িত্বে থাকা কিছু বুথ-স্তরের আধিকারিক ও সরকারি কর্মীও কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে বা মানসিক অবসাদে মারা গেছেন, এবং শুনানির কেন্দ্রে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর ধকলে কয়েকজন বয়স্ক মানুষের মৃত্যুও রিপোর্ট করা হয়েছে। যাঁদের এরকম কোনো সমস্যা হয়নি তাঁদেরও কতটা সময় এবং শক্তির অপচয় হয়েছে ভাবা দরকার। আর কী মহার্ঘ্য প্রাপ্তির আশায় তাঁরা এটা করছিলেন? সংবিধানস্বীকৃত ভোটের অধিকার। অবশ্যই ভোটারদের নথি পরীক্ষা করা উচিত, কিন্তু তার জন্যে সবাইকে অনুপ্রবেশী বা জাল ভোটার ভাবার কারণ আছে কি?

তবে এটা শুধু আমাদের দেশের বিষয় নয়। এই বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেভ (সেফগার্ড অ্যামেরিকান ভোটার এলিজিবিলিটি) অ্যামেরিকা অ্যাক্ট নামে একটি বিল

প্রতিনিধিসভায় পাশ হয় (যদিও, সেনেটে আটকে আছে) যার উদ্দেশ্য নির্বাচনে ভোটারদের মার্কিন নাগরিকত্বের প্রমাণ বাধ্যতামূলক করা। ভোটারদের নথিভুক্ত করার তথ্যের আয়ত্তাধিকার নিয়ে যে কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের যে আইনি বিবাদ হয়, তার থেকে জানা যায় ইউটা (Utah) রাজ্যে বিশ লক্ষেরও বেশি নাম পরীক্ষা করে মাত্র সাতাশটি নাম নিয়ে সমস্যা ছিল; একইভাবে, জর্জিয়া রাজ্যে প্রতি তিন হাজার ভোটারের মধ্যে গড়ে একটা মাত্র নাম নিয়ে সমস্যা, এবং তদন্তে বেরোয় সেগুলোও প্রশাসনিক ত্রুটির কারণে, কোনো কারচুপির কারণে নয়। অর্থাৎ, যে আশঙ্কা থেকে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সংঘটিত হয়, তার ভিত্তি ছিল খুবই নড়বড়ে ।

দুই

ব্যাংকের নথি বারবার যাচাই করা, নাগরিকত্ব বা অভিবাসন সংক্রান্ত পরিস্থিতি, ভোটারতালিকায় নাম বৈধ কিনা এই সবকটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রের চোখে আপনি আগাগোড়াই সন্দেহভাজন, যতক্ষণ না সে সন্দেহ অমূলক প্রমাণিত হচ্ছে। এখানেই আসল সমস্যা। আরেকটি ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গটা দেশে বিদেশে বারবার উঠে আসে, তা হলো সরকারি কল্যাণমুলক প্রকল্পের কোনো প্রাপক কি যোগ্য, নাকি সে তার অন্যায় সুযোগ নিচ্ছে।

এখন, যেকোনো আধুনিক আইনব্যবস্থার মৌলিক একটি নীতি হলো যে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির যতক্ষণ না অপরাধ প্রমাণ হচ্ছে, সে নিরপরাধ। রাষ্ট্রকে প্রমাণ করতে হবে সে অপরাধী—নাগরিকের দায়িত্ব নয় নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করা। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইংরেজ আইনবিদ ও রাজনীতিক উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন এই বিষয়ে যে বিধান দিয়েছেন তা এখনো আধুনিক আইনব্যবস্থার একটি মৌলিক নীতি হিসেবে গণ্য হয়—একজন নিরপরাধ ব্যক্তির শাস্তি হওয়ার থেকে দশজন অপরাধীর শাস্তি এড়িয়ে যাওয়া শ্রেয়। রাস্তাঘাটে যেখানে জনতার আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটছে, শুনতে বাস্তবসম্মত না মনে হলেও এটাই হলো আইনব্যবস্থার একটি মূল ভিত্তি ।

অথচ আদালতের বাইরে সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের যেকোনো আদানপ্রদানে এই নীতিটা উল্টে যায়। সামাজিক সুরক্ষার কোনো প্রকল্পের জন্যে আবেদন করা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা বা বজায় রাখা, ভোট দেওয়া, কর দেওয়া, মোবাইল ফোনের কানেকশন নেওয়া—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আপনি আপনিই, কোনো ছদ্মবেশী প্রতারক নন। রাষ্ট্রকে প্রমাণ করতে হবে

না যে আপনি কোনো অন্যায় করছেন, উল্টে আপনাকেই ক্রমাগত প্রমাণ করে যেতেই হবে যে আপনি নির্দোষ।

এই উল্টে যাওয়াটা খুব সহজেই চোখ এড়িয়ে যেতে পারে কারণ কেউ সাড়ম্বরে রাষ্ট্রনীতি হিসেবে এটাকে ঘোষণা করেনি। ছোটছোট প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের থেকে এর জন্ম হয়েছে—এখানে আঙুলের ছাপ লাগবে, ওখানে একটা নথি লাগবে, এখানে একটা ছবি বা সই লাগবে। প্রত্যেকটির সপক্ষেই যুক্তি দেওয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই সিদ্ধান্তগুলি "যতক্ষণ না কেউ দোষী প্রমাণিত সে নির্দোষ" এই নীতিকে সম্পূর্ণ উল্টে দেয়। সমস্যা হলো, এই প্রবণতা দেশে দেশে কালে কালে ক্রমাগত বাড়ছে বৈ কমছে না। তার কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে প্রথমে আমরা যেখানে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য হাতে নেই এবং তাই কী করণীয় তা নিয়ে খানিক অনিশ্চয়তা আছে, সেই রকম পরিস্থিতিতে কী করা উচিত তাই নিয়ে সিদ্ধান্ত তত্ত্ব (decision theory) কী বলে তা আলোচনা করব। তারপর বাস্তব দুনিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পদস্থ লোকেরা (যেমন, প্রশাসক, রাজনীতিবিদ) এরকম পরিস্থিতিতে কী সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা কেন অনেকসময় একজন নিরপেক্ষ বিচারকের সিদ্ধান্তের থেকে আলাদা হয় সেটা বোঝার চেষ্টা করব। এর থেকে বর্তমান দুনিয়ার যে প্রবণতা গুলো উল্লেখ করলাম তার কোনো ব্যাখ্যা খাড়া করা যায় কিনা তার চেষ্টা করব।

তিন

যদি খানিকটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে ভাবি, যেকোনো সিদ্ধান্তের পেছনে এই মৌলিক দ্বন্দ্বটি আছে—সঠিক বিকল্প নির্বাচন করতে গিয়ে, আমরা দুরকম ভুল করতে পারি—সঠিক বিকল্প বাতিল করা আর ভুল বিকল্প বাছাই করা। প্রায় একশো বছর আগে পরিসংখ্যানবিদরা এর নাম দিয়েছেন টাইপ ওয়ান এরর আর টাইপ ট্যু এরর—সত্যি অনুমান অগ্রাহ্য করছি নাকি মিথ্যে অনুমান মেনে নিচ্ছি। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রতি পদে দ্বন্দ্বটি এই রূপ নেয় : ঠিক লোককে বাতিল করছি না ভুল লোককে অন্তর্ভুক্ত করছি? পরিভাষায় একে "exclusion error" আর "inclusion error" বলা হয়। বাংলায় আমরা এই দুই ধরনের ত্রুটিকে বহির্ভূতকরণ আর অন্তর্ভুক্তিকরণ ত্রুটি, বা আরেকটু চলতি ভাষায়, ভুল করে বাদ দেওয়া আর ভুল করে নিয়ে নেওয়া বলতে পারি।

এই দুটো ভুলের জন্যে যে সামাজিক ক্ষতি তা কিন্তু আইনের চোখে সমান নয়। একজন নির্দোষ মানুষকে ভুল করে সাজা দেওয়া তার ওপর প্রত্যক্ষ এবং

অপূরণীয় একটা আঘাত, যা তার প্রাপ্য নয়। একজন দোষী মানুষ ছাড়া পেলে তার জন্যে সেটা ভালো কিন্তু সামাজিক দিক থেকে ক্ষতি তো আছেই। আগের উদাহরণটার সঙ্গে তফাৎ হলো, এই ক্ষতি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর বর্তায়না, তার প্রভাব খানিকটা বৃহত্তর সমাজে ছড়ানো। যেমন, আসল অপরাধী মুক্ত থেকে যায় কারণ মামলাটির নিষ্পত্তি হয়ে গেছে মনে করা হয়, ফলে যার সঙ্গে অপরাধ হয়েছে, সে ন্যায্য বিচার পায় না। শুধু তাই নয়, অপরাধ করলে ছাড়া পেয়ে যাওয়া যেতে পারে এরকম ধারণা যদি ছড়ায় তাহলে ভবিষ্যতে এই ধরনের অপরাধের প্রবণতা বাড়তে পারে। এরকম বহু ঘটনা আছে যেখানে ডিএনএ পরীক্ষায় দেখা গেছে যে নির্দোষ মানুষ সেই অপরাধের সাজা ভোগ করছিলেন, আর আসল অপরাধী বছরের পর বছর ধরে আরও অপরাধ করে গেছে। ব্ল্যাকস্টোনের নীতি অনুযায়ী প্রথম ভুলটাই বেশি খারাপ, তাই ফৌজদারি বিচারে খুব সচেতনভাবেই দোষ প্রমাণের দায়িত্ব বর্তায় রাষ্ট্রের ওপর, অভিযুক্তের ওপর নয়। কিন্তু উল্টো সিদ্ধান্তও আছে—অটো ফন বিসমার্ক নাকি বলেছিলেন (যদিও এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত নয়) একজন দোষী পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে দশজন নির্দোষের সাজা শ্রেয়। এখানে তুলনাটা হচ্ছে এই দুই ধরনের ত্রুটির জন্যে যে দু'ধরনের সম্ভাব্য ক্ষতি, তাদের মধ্যে—নির্দোষ একজন ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বনাম একজন দোষীকে ছেড়ে দেওয়ার । যে আইনব্যবস্থাগুলো ব্ল্যাকস্টোনের নীতি অনুসরণ করে, তারা সাধারণত প্রথমটিকেই বেশি ক্ষতিকর বলে ধরে নেয়।

প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কিন্তু এই দুই ধরনের ভুলের জন্যে যে ক্ষতি তাদের আপেক্ষিক মূল্যায়ন ঠিক এর উল্টো। ধরা যাক সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থার কোনো প্রকল্পে এমন কাউকে ভাতা বা সুবিধে দেওয়া হলো যা তার প্রাপ্য নয়। এতে কোনো নির্দিষ্ট যোগ্য প্রাপককে প্রত্যক্ষভাবে বঞ্চিত করা হলো না, কিন্তু এই ধরনের কর্মসূচির বরাদ্দ যেহেতু নির্দিষ্ট থাকে, তাই অযোগ্য কাউকে দেওয়ার ফলে সেই বরাদ্দ অর্থের একটা অংশ অপাত্রে ব্যয় হলো—যার ফলে ভবিষ্যতে কোনো যোগ্য প্রাপকের প্রাপ্য অংশ কমে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।

কিন্তু যোগ্য কোনো প্রাপককে যখন বঞ্চিত করা হয় তখন একটি নির্দিষ্ট মানুষের ওপর সেই ক্ষতিটি আরোপিত হয়। যেমন ভারতে খাদ্য ভর্তুকির বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ ব্যবস্থা যখন চালু হয়, তাতে আঙুলের ছাপ না মেলার জন্যে অনেক প্রকৃত দাবিদারকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, এর ফলে অনাহারজনিত মৃত্যু পর্যন্ত ঘটার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা অন্য বিবেচনাও আছে। যোগ্য প্রাপককে বাদ দেওয়ার প্রত্যক্ষ একটা ক্ষতি আছে—তাকে বঞ্চিত

করা হলো। কিন্তু টাকা (বা অন্য সুবিধে) যে ব্যয় হলো না, সেটা বেঁচে গেলো এবং পরে তার সদ্ব্যবহার করার, অর্থাৎ, অন্য কোনো যোগ্য প্রাপকের কাছে পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়ে গেলো।

কিন্তু অযোগ্য প্রাপককে কোনো সুবিধে দিয়ে দিলে, সেটা সম্পূর্ণ খরচের খাতায়। অনেকটা এই কারণেই প্রশাসনযন্ত্র এই ধরনের ভুলের ওপর ফৌজদারি আইনের তুলনায় বেশি জোর দেয়। কোনো যোগ্য প্রাপককে বঞ্চিত করলে তার যে ক্ষতি তা তো অদৃশ্য বা অমেয় নয় কিন্তু তাহলেও ফৌজদারি আইনের তুলনায় প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে এই যে রক্ষণশীলতা—দেবো, না দেবো না, এই বিচার করতে গিয়ে না দেওয়াই ভালো সিদ্ধান্ত নেবার যে প্রবণতা—তার কিন্তু সহজ ব্যাখ্যা আছে কর্মচারী বা আমলার প্রণোদনা ও জবাবদিহিতার কাঠামোর মধ্যে। কিছু করলে তার ভুল বার করা সম্ভব, কিন্তু কিছু না করলে ভুলও হয় না এবং জবাবদিহিও করতে হয় না!

ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা আছে তবে সেটা বিপরীতমুখী—এখানে ভুল করে সাজা দেওয়ার সম্ভাবনাটা এড়ানোর দিকে ঝোঁক বেশি, ভুল করে ছেড়ে দেওয়ারটার দিকে নয়। আদালতে ভুল রায়ে কেউ সাজা পেলে পরে তা ধরা পড়তে পারে, তাই সন্দেহ থাকলে রেহাই দেওয়াই ভালো। সাজা দেওয়াটা সক্রিয় একটা সিদ্ধান্ত, কিন্তু রেহাই দেওয়াটা তার উল্টো। তাই পরে যদি তা ভুল প্রমাণিত হয়, তখন বলা যেতেই পারে যে যথেষ্ট প্রমাণ হাতে ছিল না। লক্ষণীয় এই যে ব্ল্যাকস্টোন কিন্তু এই প্রবণতাটিকেই শ্রেয় মনে করছেন। তিনি আধুনিক অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেননা, তিনি ছিলেন পদ্ধতিবাদী (proceduralist)। তাঁর কাছে প্রধান বিষয় ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ভারসাম্য বজায় রাখা। শুধু তাই নয়, উপনিবেশগুলোতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব নিয়ে তাঁর বক্তব্য বেশ রক্ষণশীল ছিল। ইতিহাসের পরিহাস হলো ফৌজদারি আইনের জগতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিবাদের প্রতি আনুগত্য ব্ল্যাকস্টোনকে স্মরণীয় করে রাখলেও, সেই একই সুরক্ষাকবচ তিনি উপনিবেশের বাসিন্দাদের প্রতি বিস্তৃত করতে নারাজ ছিলেন। আসলে কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যথাযথ বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতি অঙ্গীকার সবসময়ে তার থেকে দূরে থাকা প্রান্তিক গোষ্ঠীদের প্রতি প্রসারিত হয়না—যে ক্রমবিস্তারের প্রক্রিয়া গণতন্ত্রের প্রগতিশীল বিকাশের জন্যে আবশ্যক ছিল এবং আছে। আজও এই দ্বন্দ্ব বিরাজমান—গণতান্ত্রিক অধিকারের সমর্থকদের মধ্যেও মতাদর্শগতভাবে অন্য প্রান্তের লোকেদের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সবসময় নিরপেক্ষ হয়না । কোনো একটি

গোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক অধিকারে টান পড়লে যারা প্রতিবাদে মুখর, তারাই অনেকসময় অন্য কোনো গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সেই একই অধিকার খর্ব হলে অতটা সহানুভূতি দেখান না—যেমন, যে ভারতীয় অভিবাসীরা বিদেশে তাঁদের অধিকারে টান পড়লে প্রতিবাদ করেন, তাঁরা দেশের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই অভিবাসীদের সম্পর্কে খুব সদর্থক মনোভাব দেখান না। এই প্রসঙ্গে পরে আবার আসবো। তাই ব্ল্যাকস্টোনের নীতিকে সাধারণ নাগরিকদের নিজস্ব ইচ্ছের প্রতিফলন হিসেবে দেখাটা ভুল হবে। আবার একই সঙ্গে, আগে যে উদাহরণগুলো আলোচনা করেছি তাতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আচরণ যদি কঠোর বা উদাসীন মনে হয়, তার মানে এই নয় যে আমলা বা সরকারি কর্মচারীরা স্বভাবত নিষ্ঠুর বা সাধারণ মানুষের সুবিধের-অসুবিধের প্রতি উদাসীন। আসল কারণ লুকিয়ে আছে ব্যবস্থার মধ্যেকার প্রণোদনা ও জবাবদিহিতার কাঠামোয়—সেই আলোচনায় এবার আসছি।

চার

আজকের দুনিয়ায় চারপাশে তাকালে দেখা যাবে সর্বত্রই রাজনীতির পরিসরে কড়া হাতে অপরাধ বা দুর্নীতি দমন করা হবে এই ধরনের স্লোগান সফল, সে কল্যাণমূলক প্রকল্পের অন্যায় সুযোগ নেওয়াই হোক বা বেআইনি অভিবাসন বা নির্বাচনে অবৈধ ভোটারের উপস্থিতি। অথচ সন্দেহের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর আরোপ লাগানো বা আইন ও প্রশাসনব্যবস্থা তাদের ওপর কঠোরভাবে প্রয়োগ করা ব্ল্যাকস্টোন নীতির ঠিক উল্টো। ফৌজদারি আইনব্যবস্থায় ব্ল্যাকস্টোন নীতি যে অল্পবিস্তর টিকে আছে তার বড়ো একটা কারণ হলো যে এর অনেকগুলো রক্ষাকবচ খুব ভেবেচিন্তে লাগানো হয়েছে—যেমন বিচারক, জুরি, অভিযুক্তপক্ষের আইনজীবী, আপিল ব্যবস্থা। তা যে সবসময় ভালো কাজ করেনা তা নিয়ে সন্দেহ নেই, তাহলেও প্রচেষ্টাটা লক্ষণীয় এবং একদিক থেকে দেখলে এ হলো সংখ্যাগরিষ্ঠবাদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা ব্যবস্থা। হয়তো তাই রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্য শাখাগুলোতে ধীরে ধীরে পিছু হটলেও অন্তত একটি শাখায় সেটা টিকে আছে। যতই হোক, গণতন্ত্র তো শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর একটা বড়ো উদ্দেশ্য হলো বিশেষ কোনো মুহূর্তে যে গোষ্ঠী জনপ্রিয়তার নিরিখে সংখ্যালঘু—সে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক যে নিরিখেই হোক না কেন—তাদের খানিকটা জনগরিষ্ঠতাবাদের জুলুম থেকে আড়াল করে রাখা।

আমরা যদি একজন আদর্শ সামাজিক পরিকল্পকের কথা ভাবি যিনি সমাজের সব ব্যক্তির ভালোমন্দ নিরপেক্ষভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তাঁর

চিন্তাধারা আর একজন রাজনীতিক বা প্রশাসকের চিন্তাধারা এক হবে না। তার কারণ রাজনীতিকদের নির্বাচনে জেতার চাপ আছে, আর প্রশাসকদের সরাসরিভাবে তাঁদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। একজন পরিকল্পক যদি বিভিন্ন মানুষের ওপর ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব মন দিয়ে বিচার করেন তাহলে হয়তো তাঁর সিদ্ধান্তগুলো ব্ল্যাকস্টোনের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে—যেমন, যোগ্য ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা বা নির্দোষ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হলে তাদের যে প্রত্যক্ষ ও পরিমেয় ক্ষতি হবে, তার ওপরে তিনি বেশি জোর দেবেন কারণ একজন অযোগ্য ব্যক্তি কোনো সরকারি সুবিধে বা ভাতা পেলে বা কোনো অপরাধী ছাড়া পেয়ে গেলে সমাজের জন্যে সেই ক্ষতি খানিকটা অপ্রত্যক্ষ। একজন রাজনীতিকের ক্ষেত্রে চিন্তাধারাটা একটু অন্যরকম। বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের বণ্টনব্যবস্থা প্রাসঙ্গিক সরকারি দপ্তরের ওপর বর্তায় কিন্তু আইনব্যবস্থার সিদ্ধান্ত সরাসরি সরকারের ওপর বর্তায় না। প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের দায়ভারের এই বিভাজনের কারণে সরকার যে যে ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সমালোচনার মুখে পড়তে পারে, সেখানে ভুল করে বাদ দেওয়াকে ভুল করে নিয়ে নেওয়ার থেকে শ্রেয় মনে করে। বহুবছর আগে অর্থনীতিবিদ টমাস শেলিং (যিনি গেম থিওরিতে তাঁর অবদানের জন্যে নোবেল পুরস্কার পান) এর একটা ব্যাখ্যা দেন যার মূলে আছে এই পর্যবেক্ষণটি—কোনো ভুল সিদ্ধান্তের পরিণাম যদি পরিসংখ্যানগত বিমূর্ত সম্ভাবনা না হয়ে একটি নির্দিষ্ট চিহ্নিত ব্যক্তির রূপ নেয় তাহলে তা অনেক বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। যেমন, একজন লোক সরকারি কোনো অনুদান অন্যায়ভাবে পাচ্ছেন ধরা পড়লে তা শিরোনাম সংবাদ হয়ে দাঁড়ায় এবং এই ধরনের প্রকল্পে দুর্নীতি কমানোর ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট দৃঢ় নয় এই ধারণাকে জোরদার করে। কিন্তু একশজন যোগ্য প্রাপককে বঞ্চিত করা হয়েছে নথি-প্রমাণাদির অভাবে খবর হিসেবে সেটা অতটা জোরদার নয় কারণ দৃশ্যত কিছু তো হয়নি—কেউ গ্রেফতার হয়নি, কাগজে কোনো ছবি বেরোয়নি, কোনো কেলেঙ্কারির গল্প গড়ে ওঠেনি। খুব অল্প কিছুসংখ্যক ক্ষেত্রে যখন এরকম ঘটনার থেকে কারো মৃত্যু হয়, তখন তা দৃশ্যমান এবং সংবাদ হিসেবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এই একই প্রক্রিয়া পূর্বোল্লেখিত অপরাধের উদাহরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—নিরপরাধ একজন কেউ শাস্তি পেয়েছেন সেটা বেরোলে যতটা হইচই হয়, একজন সম্ভাব্য অপরাধী ছাড়া পেয়ে গেলে সবসময় ততটা হয়না, যদি না পরে সে আবার কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হয়।

কল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রসঙ্গে যদি ফিরে আসি, এই অসমতার কারণ এই নয় যে বাদ পড়া যোগ্য দাবিদাররা চুপ করে থাকে। তাদের অনেকে অভিযোগ করে

এবং সাংবাদিকরা কখনও কখনও তাদের ঘটনাকে নিয়ে খবরও করে। কিন্তু অন্যায়ভাবে সুযোগ নেওয়ার খবর আর অন্যায্যভাবে বাদ পড়ার খবর পেশ করতে সংবাদ সংস্থার যে উদ্যম ও অর্থ ব্যয় হয়, তা কিন্তু আলাদা। সরকারি কোনো প্রকল্প থেকে অযোগ্য প্রাপক লাভবান হলে তার তথ্য-প্রমাণ অন্য কেউ (সরকারের কোনো দপ্তরও হতে পারে) পেশ করেছে, তাই সেটা ছাপানো সোজা, কিন্তু যোগ্য প্রাপককে বঞ্চিত করা হয়েছে সেটা প্রমাণ করা আরো কষ্টসাধ্য এবং সরকারের তরফ থেকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা আশা করা মুশকিল। শেলিং যে এই দুই ধরনের ত্রুটির ক্ষেত্রে অসমতার কথা বলেছিলেন, তা এখানে আরো জোরালো হচ্ছে সংবাদমাধ্যমে এদের পরিবেশন করার মধ্যে কোনটা কতটা ব্যয়সাধ্য সেই নিরিখে। যে রাজনীতিবিদ ভোট জিততে চান বা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান তিনি শুধু চান যে ধরনের খবর বেরোলে তাঁর ক্ষতি হবে তার সম্ভাবনা যথাসম্ভব হ্রাস করা। আর দৃশ্যমান ভুলই রাজনৈতিকভাবে বেশি ক্ষতিকর হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

যদি এই প্রক্রিয়াটি নিয়ে আরেকটু ভাবি মনে হতে পারে যত সংবাদপত্রে চর্চা হবে, তত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে, তত প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা বাড়বে, এবং দুই ধরনের ভুল নিয়ে এই অসমতার মাত্রা কমবে। কিন্তু ব্যাপারটা অতটা সরল নয়। একটি প্রচারের আলোয় আসা ত্রুটির রাজনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে তার আগে একই ধরনের কতগুলো ত্রুটি দৃশ্যমান হয়েছে তার ওপর। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা জনগণকে "এসব তো হয়েই থাকে" এই ধরনের অসাড়তার মধ্যে নিয়ে যেতে পারে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে "আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে" জাতীয় অসহিষ্ণুতার দিকেও নিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ, ছবিটি কোনো স্থিতিশীল ভারসাম্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, কখনো জনমত ব্ল্যাকস্টোনের নীতির কাছাকাছি চলে যেতে পারে, আবার কখনো কখনো তার সম্পূর্ণ উল্টোদিকে।

ভেবে দেখতে গেলে, এ বেশ অস্বস্তিকর এক উপলব্ধি। যে প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমরা দায়বদ্ধতার জন্যে সচরাচর প্রশংসা করি, যেমন, মুক্ত সংবাদমাধ্যম, প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন, এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্যে আইন, তা কিন্তু বিচারকক্ষের বাইরে সরকারকে এমন একটা জায়গায় ঠেলে দিতে পারে যা কেউ অপরাধী প্রমাণিত হওয়ার আগে নির্দোষ, এই অবস্থান থেকে অনেকটা দূরে। সমস্যাটা দায়বদ্ধতার নীতি নিয়ে নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের ভারসাম্য নিয়ে।

কোন ধরনের ভুলের ওপর কতটা মনোযোগ পড়বে, তা নির্ভর করবে কোনটা নিয়ে কতটা সমালোচনা হবে। আপাতভাবে যে ভুল নজরের বাইরে থাকে তার

তুলনায় দৃশ্যমান ভুলের ওপর মনোযোগ অনেক বেশি পড়ে। তার ফলে প্রশাসনব্যবস্থা ও রাজনীতিবিদদের কাছে যে ধরনের সতর্কতা এড়ানো উচিত ছিল, সেটা পুরস্কৃত হয়—যেমন, রেশনের দোকানে আঙুলের ছাপ না মিললেই সঙ্গে সঙ্গে আবেদন বাতিল করা কর্মীকে "দুর্নীতি রোধে তৎপর" বলে বাহবা দেওয়া হয়—আবার যে ধরনের সতর্কতা প্রয়োজনীয় সেটা কম গুরুত্ব পায়।

বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে কথাটা হলো যে 'দোষী প্রমাণিত হওয়ার আগে অবধি নির্দোষ' এই নীতি তখনই টিকে থাকতে পারে যখন প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনমতের চাপ থেকে খানিকটা সুরক্ষিত রাখা হয়েছে, বিশেষত সেই নাগরিকদের থেকে যারা বেশি সংগঠিত এবং সোচ্চার। আইন-আদালতের জগতে ব্ল্যাকস্টোন নীতি অনেকটাই সংরক্ষিত করে রাখা যায় কারণ বাদীপক্ষের সমর্থকদের ভোটে রায় জারি করা হয় না, তার জন্যে বিচারক, বিবাদীপক্ষের উকিল, জুরি, প্রমাণাদি, আপিলব্যবস্থা এইসবগুলি বাঁধের মতো জনমতের ঢেউকে আটকে রাখে। কিন্তু সরকারি কল্যাণ দপ্তর, নির্বাচন কমিশন, বা ব্যাংকের নথিপত্র বিভাগের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। কোনোরকম দুর্নীতি, অপচয়, বা অনিয়মের অভিযোগ সংবাদপত্রের শিরোনাম হলে যা শোরগোল হবে সেটা এড়াতে তারা কার্যত ব্ল্যাকস্টোনের পথ ছেড়ে বিসমার্কপন্থীর মতো সন্দেহ হলেই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার অবস্থান নেন, তার জন্যে নির্দোষ ব্যক্তিদের হয়রানি হলে হোক। গণতন্ত্রে এইধরনের দিকপরিবর্তন ঘনঘটা করে ঘোষিত হয় না, আস্তে আস্তে সবার অলক্ষ্যে হতে থাকে।

গণতন্ত্রের এই যে পশ্চাদপসরণ তার প্রক্রিয়াটা এখন অবধি আমাদের বক্তব্যে মূলত নিষ্ক্রিয় ছিল: দৃশ্যমানতা এক ধরনের ভুলের প্রবণতা বাড়িয়ে দেয় আর প্রতিষ্ঠানগুলো তার সঙ্গে মানিয়ে নেয়। দক্ষিণপন্থী জনবাদের ভূমিকা অনেক বেশি সংগঠিত এবং সক্রিয়। তারা কোনো জালিয়াতি বা অন্যায়ের ঘটনা ঘটা অবধি অপেক্ষা করে না, তারা তাদের বিরাগভাজন কোনো সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সম্পর্কে এরকম ঘটনা খুঁজতে থাকে, খুঁজে পেলে তো কথা নেই, নেহাতই না পেলে বানিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করতে থাকে যে এরা অন্যায় সুযোগ নিয়ে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থাটাকে ভেতর থেকে ক্ষইয়ে দিচ্ছে। বহিরাগতরা একটা ব্যবস্থার সুযোগ নিচ্ছে, আর ক্ষমতাসীন শ্রেণী সেটা করতে দিচ্ছে এই আখ্যানটি রাজনৈতিকভাবে খুব শক্তিশালী, বিশেষত বহিরাগত কে সেটা যদি ধর্ম, বর্ণ, জাতি বা অভিবাসনের নিরিখে হয়। এরকম গোষ্ঠীর একজনও কেউ কোনো অন্যায় সুযোগ পেলে বা ভোট দিতে পারলে বা অপরাধ করে সাজা না পেলে তা সংখ্যার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ নয়,

কিন্তু তার রাজনৈতিক তাৎপর্য অসীম হতে পারে কারণ তারা শেলিংয়ের অর্থে শনাক্তযোগ্য গোষ্ঠী।

পাঁচ

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী তালিকার সংশোধন, যার কথা আগে বলেছি, তাতে যাঁরা আজীবন ভোট দিয়ে এসেছেন তাঁদের জাতক পত্র, বাসস্থান সংক্রান্ত দলিল বা পাসপোর্ট দেখিয়ে নতুন করে প্রমাণ দিতে বলা হলো তাঁরা বৈধ ভোটার। এই ঘটনাটিকে নিছক স্থানীয় বলা যায় না, কারণ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি এই নিয়ে যে বিতর্কে জড়ালো তার মূল কথা হলো রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধে আদায় করা হচ্ছে। এটা লক্ষণীয় যে কেউ বলছেন না যে এই যাচাইকরণের পক্ষে কোনো যুক্তি নেই—বিতর্ক হলো যেভাবে এই প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ করা হলো তা রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট কি না, তাই নিয়ে। নির্বাচন কমিশন যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গ, কার্যত রাজ্য এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলদুটির মধ্যে এই পদ্ধতির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক বেঁধে গেলো—অর্থাৎ, কাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হলো, সেটা পক্ষপাতদুষ্ট কিনা, এই নিয়ে।

আগেই লিখেছি একটি ধরনের ঘটনা প্রায় একই সময়ে অ্যামেরিকায় ঘটে চলেছিল এবং এটা নিয়ে দুটি রাজ্যে (ইউটা এবং জর্জিয়া) তদন্ত হলে দেখা যায় খুবই নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা ছিল কিন্তু সেক্ষেত্রেও মূল সমস্যা ছিল প্রশাসনিক ভুল, জালিয়াতি নয়। নির্বাচনী ব্যবস্থার অপব্যবহার হচ্ছে এবং সেখানে কোনো সংগঠিত গোষ্ঠীর সচেতন চক্রান্ত আছে এই যে হুজুগ তুলে গোটা প্রক্রিয়াটা সংঘটিত হয়, তার কোনো ভিত্তি ছিলো না। সম্ভাব্য আশঙ্কা আর প্রমাণিত বাস্তবের মধ্যে এত বড়ো ফারাক দেখে প্রশ্ন জাগে, তবে এতো খরচ করে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হলো কেন? একটা সম্ভাবনা হলো, সত্যি ভাবা হয়েছিল অনেক গোলযোগের ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যাবে, তা পাওয়া গেলো না, অর্থাৎ সন্দেহটা অমূলক ছিল। আরেকটা, আরো অস্বস্তিকর সম্ভাবনা হলো, খামখেয়াল বা নিছক হুজুগ নয়, ফলাফল যাই হোক না কেন, পুরো ব্যাপারটা রাজনৈতিক সুবিধের জন্যেই করা হয়েছে। যাঁদের ওপর নথিপত্র জোগাড় করে নিজেকে প্রমাণ করার মাশুল সবচেয়ে বেশি পড়ে তারা সচরাচর সবচেয়ে প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষ (যেমন অশ্বেতাঙ্গ, শরণার্থী, সামাজিক সুরক্ষাপ্রকল্পের ওপর নির্ভরশীল), যাঁদের রাজনৈতিকভাবে এর প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কম—অর্থাৎ ঠিক যাঁরা ব্যবস্থাটার অপব্যবহার করছেন বলে দক্ষিণপন্থী প্রচার করা হয়। ঠিক এই কারণেই অপব্যবহার

শেষমেশ প্রমাণ না করা গেলেও রাজনৈতিক ঝুঁকি কম থাকে, অথচ ভোটজালিয়াতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের কাছে ফলাফল নির্বিশেষে লাভজনক হতেই পারে।

একই ধরনের প্রবণতা বাম রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় কিন্তু সেখানে যে গোষ্ঠীকে নিশানা করা হয় সেটা আলাদা। দক্ষিণপন্থী আন্দোলনে "অপর" হলো অভিবাসী, দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ যারা সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভরশীল, আর সংখ্যালঘু শ্রেণী দক্ষিণপন্থীদের চোখে যারা বাইরে থেকে এসে ব্যবস্থাটার সুযোগ নিচ্ছে এবং আস্তে আস্তে ভেতর থেকে সেটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এদের নানা কুকাজ দৃশ্যম্যান করাটাই দক্ষিণপন্থী জনবাদী আন্দোলনের একটি মূল উদ্দেশ্য। বামপন্থী আন্দোলনের লক্ষ্য অনেক সময়েই ক্ষমতার শীর্ষে থাকা কেউ, যারা বাইরের বা প্রান্তিক লোক বা গোষ্ঠী নয়, বরং একদম ভেতরের প্রভাবশালী লোক বা সংস্থা, যেমন কোনো কর ফাঁকি দেওয়া ধনকুবের, কোনো বিতর্কিত কর্পোরেট সংস্থা, কোনো অসাধু রাজনীতিবিদ। দুই ক্ষেত্রেই কোনো একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমত গড়ে উঠতে পারে সমগ্র একটা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, যদিও তাদের নৈতিক ভিত্তি অবশ্যই এক নয়—একটি ক্ষেত্রে তা ক্ষমতাহীনদের নিপীড়ন যা আইন প্রয়োগের অজুহাতে করা হয়, অন্য ক্ষেত্রে তা হলো ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীগুলির ওপর দায়বদ্ধতার চাপ সৃষ্টি করা।

কিন্তু যে ব্যক্তির ওপর অভিযোগ বা সন্দেহ, এবং যে নির্দোষ হতেও পারে, তার দিক থেকে দেখলে পদ্ধতিগত প্রশ্নটা থেকে যায়। এটা কিন্তু কোনো মধ্যপন্থার যুক্তি নয় এবং বাম ও দক্ষিণপন্থী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি এক বলা হচ্ছে তাও নয়। দেশে বিদেশে বহু বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্ষমতাসীন বামপন্থী সরকারের কর্তৃত্ববাদ বা অগণতান্ত্রিক প্রবণতার প্রতিবাদ করেছে। আসল সমস্যাটা হলো পদ্ধতি নিয়ে—আমরা যাদের বিরুদ্ধে তাদেরও গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। এটা কোনো উদারপন্থী বিলাসিতা নয়, উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, পদ্ধতির জায়গাটার ভিত নড়বড়ে হলে সেই আন্দোলনের এবং তার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক প্রভাবের অনেক বড়ো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

ছয়

সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে স্বৈরতন্ত্রের প্রবণতা দক্ষিণপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বেশি—এবং আরও পেছনে তাকালে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, উপনিবেশবাদ, বা সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে যে প্রযোজ্য, এ তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে রাষ্ট্রব্যবস্থা যে স্বৈরতান্ত্রিক ছিল এ কথা অনস্বীকার্য। একজন ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত হওয়ার আগে অবধি নির্দোষ পরিগণিত হওয়া উচিত, এই নীতি সেখানে সবসময় মানা হয়নি। রাষ্ট্র বা পার্টির বিরুদ্ধে কথা বলার জন্যে কোনো ব্যক্তিকে শ্রেণীশত্রু বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী তকমা দিয়ে নিপীড়ন করা হয়েছে—সোভিয়েত রাশিয়ায় কুলাকদের ক্ষেত্রে যেমন গোটা একটা শ্রেণিকেই এই তকমা দেওয়া হয়েছিল। আবার কখনো গোটা জাতিগত বা জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রবিরোধী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে নিপীড়ন করা হয়েছে, যেমন চিনে উইঘুর বা তিব্বতীদের ক্ষেত্রে। দক্ষিণপন্থী একনায়কতন্ত্রে যা বর্ণ বা ধর্ম বা জাতি ধরে করা হয়, তার সঙ্গে পদ্ধতিগতভাবে কোনো ফারাক নেই—যে 'অপর' সে সন্দেহজনক।

যুক্তি কিন্তু দেওয়া হতো বৃহত্তর স্বার্থের, "লক্ষ্যই উপায়কে ন্যায্যতা দেয়" হলো পরিণামবাদের চূড়ান্ত উদাহরণ, যেখানে ন্যায্য পদ্ধতির কথা উড়িয়ে দিলেই চলে। উদ্দেশ্য মহৎ হলে পদ্ধতি নিয়ে পিটপিট করলে কাজ হবে না, এটা এক ধরনের বুর্জোয়া বিলাসিতা, এরকম যুক্তি বামমহলে অনেক শোনা গেছে। সমস্যা হলো, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তা যদি সত্যিও হয়, একবার গেড়ে বসলে তা অবধারিতভাবে গোটা ব্যবস্থাটার মধ্যে অগণতান্ত্রিক প্রবণতা ঢুকিয়ে দেয় যা যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পেলে স্বৈরতন্ত্রের বিষবৃক্ষে পরিণত হতে বাধ্য।

এর কোনোটার জন্যেই কোনো নির্দিষ্ট খলনায়ক বা উৎসবিন্দু সন্ধান করার দরকার নেই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে জনবাদী ঝোঁক আমরা চারপাশে দেখছি তার পেছনে যে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা ব্যক্তির হাত আছে তা নয়, আছে কিছু বিচ্ছিন্ন প্রবণতা—দৃশ্যমানতা, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক চিন্তাধারা, এবং রাজনৈতিক সুবিধাবাদ। আস্তে আস্তে এই প্রবণতাগুলোর সমবেত প্রভাব পদ্ধতিগত নিষ্ঠাচারের থেকে স্বৈরতন্ত্রের দিকে আমাদের ঠেলে নিয়ে যায়।

ব্ল্যাকস্টোনের "প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী ঠাউরানো অনুচিত" আর বিসমার্কের "সন্দেহ হলেই জেলে ভরো" এই দুই অবস্থানের মধ্যে আমার নিজস্ব অবস্থান অনেকটা প্রথমদিকে ঝুঁকে আছে। এবং, এই অবস্থান মতাদর্শনিরপেক্ষ হওয়া উচিত বলে মনে করি। দক্ষিণ বা বাম দুদিকেই সমস্যা হলো অনেকেই তাঁদের অপছন্দের

গোষ্ঠীর (প্রথম ক্ষেত্রে অভিবাসী বা বর্ণ বা ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘু কোনো সম্প্রদায় আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এলিট বা বিত্তবান শ্রেণী) প্রতি এই বিচারধারা প্রয়োগ করতে রাজি নন, যদিও তাঁদের সমর্থক কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে এটা করা হলে তখন তাঁরা প্রতিবাদে মুখর হন। গণতান্ত্রিক অধিকার সর্বজনীন হতে গেলে কাউকেই যথাযথ বিচারের আগে দোষী ধরে নেওয়া অন্যায়। ভলতেয়ারের নামে প্রচলিত সেই অমোঘ উক্তি খানিক পাল্টে বলতে গেলে—তোমার চিন্তাধারার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ ভিন্নমত হতে পারি কিন্তু তোমার গণতান্ত্রিক অধিকার অন্যায়ভাবে খর্ব করা হলে, আমি তার প্রতিবাদ করবো!

আরো তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে এখানে সংঘাতটা হলো পদ্ধতিবাদ এবং পরিণামবাদের মধ্যে—যার বিচার করা হচ্ছে সে কি বিধিসম্মত পদ্ধতির সুযোগ পাচ্ছে, না কি, "যারে দেখতে নারি তারে দাও শূলে চড়িয়ে" এই ধরনের মনোবৃত্তি কাজ করছে। মানতেই হবে, পদ্ধতিভিত্তিক এই অবস্থান খুব আরামদায়ক নয়। আসলে গতানুগতিক আখ্যানের কোনো বিশেষ গোষ্ঠী, শ্রেণী, বা ব্যক্তিকে খলনায়ক খাড়া করা, বা "উদ্দেশ্য ভালো হলে পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন কেন" এই ধরনের ভাবনা তুলনায় অনেক স্বস্তিদায়ক। কিন্তু ক্ষণিকের এই স্বস্তি কি ঠেলে দেয় না এমন এক পথে যাতে এক খলনায়ক গেলে আরেক খলনায়ক আসে, রক্তবীজের মতো একের পরে এক এরকম খলনায়ক আসতেই থাকে?

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: মনীষিতা দাশ, সীমন্তিনী মুখোপাধ্যায়, এবং সৌরভ চট্টোপাধ্যায় লেখাটির প্রাথমিক খসড়া পড়ে অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।]

সূত্রনির্দেশ

Karen Jenni and George Loewenstein. "Explaining the identifiable victim effect." Journal of Risk and uncertainty 14.3 (1997): 235-257.

Alexander Volokh (1997), "n Guilty Men," University of Pennsylvania Law Review, 146(1): 173–216.

J. Shahar Dillbary and Thomas J. Miceli (2023): "Of Sinners & Scapegoats: The Economics of Collective Punishment", Washington University Law Review, Vol. 100, pp. 1299–1351.